এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

জানুয়ারি ২০১৪

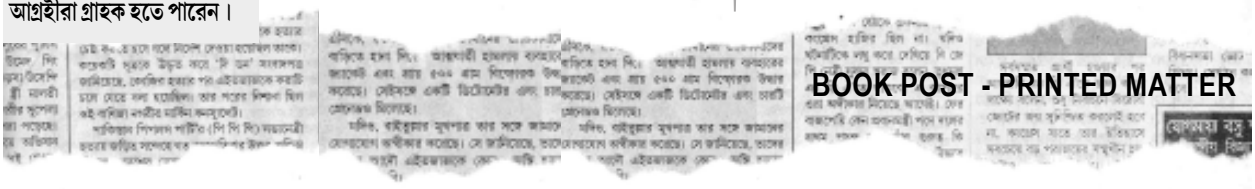

তাপিত

১৯/১০৫

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সালফার-ডাই-অক্সাইডের দূষণের মাত্রা বাড়ছে। এই পরিমাণ এখন ষাট শতাংশ। ২০১০-এ ভারত এই ব্যাপারে আমেরিকাকে ছাড়িয়েছে। এইসব ধরা পড়ল নাসার উপগ্রহে।

Eস !

১৯/১০৬

ই-বর্জ্য বাড়ছে। ২০১৭ অব্দি ফি বছর ই-বর্জ্যের পরিমাণ হবে প্রায় দুশোটি এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর সমান। আগামী দিনে মার্কিন ই-বর্জ্যের গন্তব্য হবে ভারত। এইসব উল্লেখ রাষ্ট্রসংঘের সাবধানবাণীতে।

সাফ কথা

১৯/১০৭

প্লাস্টিক বর্জ্য-ব্যাপারিদের সরকারি নথিভুক্ত হতে হবে। এই নথিভুক্তি হবে প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড হ্যান্ডলিং রুলস ২০১১ মেনে। দেশের সব পুর-কর্তৃপক্ষে এই মর্মে নির্দেশ গেছে। এই সিদ্ধান্ত রবার ও রবার-সমধর্মী বস্তুর অনিমিত দহন বন্ধ করতে। এই সিদ্ধান্তের পেছনে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনাল।

খাদ্য বি শৃঙ্খল

১৯/১০৮

পাঁচ মিমি-র কম মাপের প্লাস্টিক কণা এখন মহাসাগরের প্রধান বর্জ্য-দূষণ। এই কণা মহাসাগরের বালি-কাদায় মিশছে। বালি কাদার এই কণা থেকে বিষ-রাসায়নিক ঢুকছে সাগর-প্রাণীর পাকস্থলীতে। ফলে বিপন্ন হচ্ছে খাদ্যশৃঙ্খল। এইসব ঘটছে ষাটের দশক থেকে। এইসব বেরিয়েছে কারেন্ট বায়োলজি কাগজে।

থাম !

১৯/১০৯

উত্তরবঙ্গে একশৃঙ্গ গণ্ডার নিয়ে চিন্তা। এই গণ্ডার আছে উত্তরবঙ্গের জলদাপাড়া অভয়ারণ্য আর গরুমারা জাতীয় উদ্যানে। এই গণ্ডার লম্বা ঘাসের জঙ্গলে থাকে। এই লম্বা ঘাসের জঙ্গল কমছে। জঙ্গল কমার কারণ চারণভূমি বাড়া, মানষের আনাগোনা গড়া, সরকার বরাদ্দ না থাকা ইত্যাদি। এমন হতে থাকলে এই গণ্ডার কমবে। এক সমীক্ষায় এসব বেরিয়েছে। সমীক্ষার খবর আছে স্যাংকচুয়ারি পত্রে।

একটি দেশের গল্প

তরুণ দেবনাথ

সম্প্রতি চমস্কি বলছেন মানবসভ্যতার উপর অনেকগুলি খাঁড়া ঝুলছে। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হল পরিবেশগত বিপর্যয়। ফলে মানুষের ভবিষ্যৎ খুবই করুণ। প্রকৃতি তার ধারণ ও পুনরুজ্জীবন ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। এর চিহ্নগুলি খুব স্পষ্ট। চোখ-কান খোলা রাখলেই এটা বোঝা যাচ্ছে। বিশেষ করে বিজ্ঞান পত্রিকাগুলি এই সতর্কবার্তা দিনকে দিন স্পষ্টতর করছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ১৯৬১ সালে মানুষ সারা পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করত। বর্তমান সভ্যতাকে ধরে রাখার জন্য সখানে এখন সেখানে ১.৫ গুণের বেশি সম্পদ দরকার। শতকরা ৮০ ভাগ দেশের মানুষ নিজেদের ক্ষমতার সীমার বাইরে গিয়ে জীবনযাপন করছেন। এই দেশগুলি হয় নিজের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ শেষ করছে, কিংবা অন্যদেশকে নিঃশেষ করেছে। জাপানিরা ৭.১ ভাগ জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করছে। আর ইটালির দরকার ৪টে ইটালির।

এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় বিশ্বজুড়ে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে। কিছু মানুষ একান্তভাবে সম্ভাব্য ধ্বংসকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে বেশ কিছু উদ্যোগ চলছে এই বিপদকে উপেক্ষা করার।

আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যেন একটি স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন পেতে পারে-এই চেষ্টায় অগ্রগণ্য হচ্ছেন 'আদিম সমাজের মানুষেরা'। অন্যদিকে যারা এই আদিম মানুষগুলিকে নির্মূল করেছে বা প্রান্তিক বানিয়েছে, তারা উৎসাহ সহকারে সভ্যতাকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদকে নষ্ট করে উন্নয়ন, আর্থিক বৃদ্ধি অর্থাৎ জিডিপি কে সামনে রেখে উন্নয়ন পৃথিবীকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এইটাই দুর্ভাগ্যজনকভাবে সাম্প্রতিক ইতিহাসের শক্তিশালী ধারা। এটা একধরনের উন্মাদ মানসিকতা-যা কিনা সত্যিই সমস্ত ধরনের যুক্তির বিপরীতে অবস্থান করে। শুধু তাই নয় বিশাল কর্পোরেট প্রচার যন্ত্র এই উন্মাদ মানসিকতা সবার মনে গেঁথে দিচ্ছে এবং শক্তিশালী করছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটি দেশের কথা শুনব, যার নেতা বলেছেন- 'ভোগবাদ নির্ভর সমাজ' আর 'উন্নয়ন ও মানব প্রজাতির জন্য দরকারি প্রাকৃতিক সম্পদ ও শক্তি' কখনই একসাথে টিকে থাকতে পারে না। দেশটির নাম কিউবা ।দেশটির মাথাপিছু আয় খুব কম, কিন্তু জীবনের গুণগত মান উন্নত। এটা একটা ধাঁধা। একটি দেশ বস্তু সম্পদের নিরিখে গরিব কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পরিষেবায় উন্নততম দেশগুলিকে টেক্কা দিচ্ছে। মানব উন্নয়নে অনেক এগিয়ে কিন্তু পরিবেশের উপর চাপ কম-ফলে খনিজ জ্বালানির ব্যবহার ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণও কম। বিনা পয়সায় শিক্ষা, বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য-পরিষেবা, প্রাথমিক পুষ্টি আর বয়স্ক লোকেদের জন্য সাহায্য- দেশটি সংকটজনক অবস্থাতেও চালিয়ে গেছে। ডব্লুডব্লুএফ তাদের ২০০৩-এর লিভিং প্ল্যানেট রিপোর্টে সুস্থায়ী উন্নয়নের নিরিখে এই দেশটিকে বিশ্বের মধ্যে একমাত্র দেশ বলে চিহ্নিত করেছে। এই দেশের মানুষদের থাকার জায়গা ছোট (২৫০ বর্গফুট, আমেরিকায় ৮০০ বর্গফুট), ব্যক্তিগত ভোগ্যদ্রব্যের ব্যবহার কম, কিন্তু তারা জানে তাদের বাড়ির শিশু উপযুক্ত শিক্ষা পাবে,তাদের কাউকে ভুখা থাকতে হবে না কিংবা বাসস্থানহীন অবস্থায় হবেনা।

কিন্তু যানবাহনের বেলায় ব্যক্তিগত গাড়ির বদলে গণ-পরিবহন ব্যবস্থা, সরকারি বেসরকারি গাড়িতে লিফট, ঘোড়া টানা গাড়ি ইত্যাদি। এর সাথে সুবিস্তৃত ট্যাক্সি পরিষেবা। এই দেশটি কৃষি ব্যবস্থায় প্রচুর বদল এনেছে। যন্ত্র ও রাসায়নিক-নির্ভর রফতানিমুখী চাষ বদলে ফেলা হয়েছে। রাসায়নিক সার, জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও যন্ত্রের ব্যবহার কমানোর জন্য ব্যাপক ব্যবস্থাপনা তৈরি করেছে। রাসায়নিক সারের ব্যবহার আগের তুলনায় কমেছে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জৈবসার, পশু দিয়ে হাল, মিশ্রচাষ, জৈব কীটনাশক ইত্যাদি। এর জন্য উপযুক্ত মূল্য ও বন্টণ ব্যবস্থা। এমনকি শহরের ফাঁকা জমিতে চাষ। সঙ্গে আছে চাষিদের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে পরিবেশমুখী কৃষি ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছেন। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮-র মধ্যে সবজি উৎপাদন দ্বিগুণ-এরকম অনেক সাফল্যের উদাহরণ আছে। ফাও-এর রিপোর্ট বলছে দেশের মানুষের জন্য মাথাপিছু দৈনিক ক্যালরির হার, সমস্ত মহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। মজার কথা হল, এ সমস্ত কিছুই হয়েছে আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাহায্য ছাড়াই এবং মাথাপিছু কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের মাত্রা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি হল-শিক্ষামন্ত্রককে সঙ্গে নিয়ে ছোটদের বিশেষ 'শক্তি-শিক্ষা'। শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে ছোটদের শেখানো যাতে তা শুধু পরিবার নয়, সমগ্র সমাজের বিদ্যুৎ ব্যবহারের রীতিনীতিকে পাল্টে দিতে পারে। শক্তি ব্যবহারে দেশের মূল লক্ষ্য ছিল আর্থিক ক্ষেত্রে সুস্থায়ী উন্নয়ন ও শক্তির অনিশ্চয়তা কমিয়ে আনা। এর জন্য তারা অনেক ধরনের ব্যবস্থা নেয়, সাধারণ বাতির বদলে সিএফএল, পুরোনো জীর্ণ-শীর্ণ-পাখা, ফ্রিজ, বাতানুকুল যন্ত্র, টিভি, মোটর পাল্টে ফেলা। কুকারের ব্যবহার বাড়ানো। পুর্ণব্যবহারযোগ্য শক্তি যেমন উইন্ডমিল, জলবিদ্যুৎ সৌরশক্তি, জৈবগ্যাস, জৈব জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো। এর জন্য সরকার থেকে কম দামে ওই ধরনের উন্নত যন্ত্র দেওয়া হয় । সমস্ত কিছু মিলিয়ে দেশের মানুষ সারা বিশ্বের চেয়ে গড়ে শতকরা ৪৩ ভাগ কম শক্তি ব্যবহার করে, যার ফলে শতকরা ৪৪ ভাগ কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ছাড়ে। আমেরিকার তুলনায় এই দেশের মানুষ শতকরা ৮৫ ভাগ কম শক্তি খরচ করে। এই দেশের শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক কম জিনিসপত্র, কিন্তু দেশের মানুষের মানবিক ও সামাজিক সম্পদ অনেক বেশি। স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিচর্যা দেশের সংবিধান দ্বারাই সুরক্ষিত। কিউবায় প্রতি হাজার মানুষের জন্য ৬.৪ জন ডাক্তার (আমেরিকায় ২.৬৭) সামগ্রিক পরিকল্পনার প্রতিষেধক ও প্রতিরোধ ব্যবস্থায় জোর দেওয়া হয় । শিশু মৃত্যুর হার হাজার জন্ম প্রতি মাত্র ৪.৮ (আমেরিকায় ৬.০৬ বছর) সেভ দি চিলড্রেন মায়েদের জন্য ও মেয়েদের জন্য দুটি সূচক তৈরি করেছে। তাদের ২০১২ সালের হিসেব বলছে এই দেশটির স্থান উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় এই দেশের মানুষের গড়ে ১৮ বছর প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় নিয়োজিত থাকে। আমেরিকার জন্য এই সংখ্যাটি ১৫ বছর আর বিশ্বের সব দেশ মিলিয়ে ১১ বছর। সুশিক্ষিত জনগণই দেশকে সজীব রাখতে আর দেশের বিভিন্ন অসুবিধাগুলি দূর করতে সাহায্য করে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রিপোর্ট বলছে-স্কুলে শতকরা ১০০ ভাগ ভর্তি ও উপস্থিতি, প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ বয়স্ক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা সহ সমস্ত স্তরের শিক্ষায় মেয়েদের সমান উপস্থিতি, শক্তিশালী বিজ্ঞানমুখী শিক্ষণ-ব্যবস্থা বিশেষ করে রসায়ন ও চিকিৎসাক্ষেত্রে গ্রাম-শহর মিলিয়ে সুসংহত শিক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি সব মিলিয়ে এই দেশের শিক্ষায়তন উন্নত দেশগুলির সমান, কিন্তু আর্থিক অবস্থা একটি উন্নয়নশীল দেশের মতো।

এই দেশ দেখাচ্ছে সারা বিশ্বের দরকার শক্তির জন্য বিপ্লব। কিন্তু এই কাজটি করতে গেলে প্রথমেই দরকার চেতনার বিপ্লব। যে চেতনার উন্মোষিত হবে কার্বন-নির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়নের চলতি মডেল থেকে বেরিয়ে আসার স্বীকৃতি।এই চেনার বিরোধীতা ধনী দেশগুলি করছে। কিন্তু ইতিহাসের লেখা পরিষ্কার মানুষ বাঁচবে, উন্নততর হবে, যদি মানবসভ্যতার সংকটের সন্ধিক্ষণে এই দেশ থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়।

এখন একটি কথা বলা দরকার কিউবাও জ্বালানি নির্ভর একটি মডেল অনুসরণ করত। ১৯৯০-এ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর তাদের তেল আমদানি ও অন্যান্য বাণিজ্য চূড়ান্তভাবে ধ্বসে পড়ে। আমেরিকা সুযোগ বুঝে আগেকার বাধানিষেধের সঙ্গে নির্মমভাবে আরও অনেক বাড়া ও এমনকি ক্ষতির চেষ্টা করে। এইরকম চূড়ান্ত জাতীয় সংকটের থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কিউবা বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু এর সঙ্গে এটা অবশ্যই স্বীকার করা উচিত যে কিউবার মানবিক ও সামাজিক অর্থাৎ সচেতনতা, সামাজিক বোধ, সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদির ভিত্তি আগের থেকেই দৃঢ় ছিল। কিউবায় গণ সংগঠনগুলির সঙ্গে বেসরকারি সংগঠনগুলিও এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদের সঙ্গে সরকারি উদ্যোগগুলির যোগাযোগ জরুরি। তার জন্য রেডিও ও টিভি সংকটের অবস্থা ও সরকারি উদ্যোগগুলি নিয়ে জনগণের সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করে। যার ফলে ১৯৯-র গভীর সংকটের সময় নতুন সিদ্ধান্তগুলি রূপায়ণ করতে সারা দেশই এগিয়ে আসে।

এবার একটু নিজের দেশের দিকে তাকানো যাক। সংবাদে প্রাকশ, ভারতের আমদানির শতকরা ৩৪ ভাগ খরচ হয় তেল কেনার জন্য। এরপর আছে- অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য স্থায়ী যন্ত্রপাতি, সোনা, রূপা ও বিভিন্ন রত্ন সামগ্রী, কয়লা ও কয়লাজাত দ্রব্য, ভোগ্যপণ্য, রাসায়নিক সার ইত্যাদি। আমদানির বেশিরভাগই শক্তি ও বিলাসবাসনের খরচ মেটাতে যায়। এদিকে ভারতে চলতি খাতায় ঘাটতি বাড়ছে অর্থাৎ আমদানি খরচের তুলনায় রফতানি আয় ও তার সঙ্গে অনাবাসী ভারতীয়দের পাঠানো বিদেশী মুদ্রা ও বিদেশীর বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে। ভারতের টাকার মূল্য ভীষণভাবে কমছে। জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারতের আমদানি খাতে খরচ বাড়ছে, কিন্তু রফতানি বাড়ছে না। একই সঙ্গে বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই, এফআইআই) ভারতে আসার বদলে দ্রুত বাইরে চলে যাচ্ছে। নীটফল চলতি খাতে ঘাটতি বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে। ভারত দেশটাই টলে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালের মূলধারা অর্থনীতিবিদরা তাই বলছেন-রফতানি বাড়াও দেশকে এমনভাবে বাণিজ্যের জন্য তৈরি কর যাতে বিদেশীরা এই দেশমুখী হয়ে যায়। অর্থাৎ এতদিন যা করে বিপদ ডেকে আনা হল, সেই বিপদ

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

কাটানোর জন্য পুরোনো ওষুধের মাত্রা বাড়িয়ে যাও। এই জন্যই আইনস্টাইন বলেছিলেন ‘যদি আমরা যেটা করছি, সেটা করতে থাকি, তবে আমরা যা পেয়ে আসছি, তাই পাব। পাগলামোর একটা সংজ্ঞা হচ্ছে- একই কাজ করে যাওয়া আর অন্য ফল আশা করা’।

সত্যি কথা বলতে বামপন্থী-ডানপন্থী সবাই যখন চিন-আমেরিকার জিডিপি নির্ভর উন্নয়নকেই একমাত্র মডেল হিসাবে ভাবছেন-তখন কিউবা নতুনভাবে ভাবতে শেখায়। কৃষি-শিল্পকে সুসংহত করে, স্বাস্থ্য-শিক্ষা সুনিশ্চিত করে, মানুষের জন্য মানুষের সম্প্রীতি বাড়িয়ে, জীবন-জীবিকার সুনিশ্চিত স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে পতঙ্গের মত আগুনের দিকে এগিয়ে যাব কিনা-এটা ভাবার সময় পার হয়ে যাচ্ছে। এই লেখাটি অর্থনীতির উপর কোনো বিশ্লেষণ নয়, কিন্তু অবশ্যই অর্থনীতিকে সমাজ, সংস্কৃতি ও পরিবেশকে জড়িয়ে নিয়ে আলাদাভাবে দেখার চেষ্টা মাত্র।

পুনশ্চ : কয়েকদিন আগে দিল্লিতে ভারত সরকারে একজন সচিব পর্যায়ের আধিকারিক বলছিলেন ‘কিউবায় সুস্থায়ী চাষের উপর খুব ভালো কাজ হয়েছে। আমরা এই ধরনের প্রযুক্তি প্রয়োগ করছি।’’ আমি বললাম-এই ধরনের উদ্যোগ থেকে ফল পেতে গেলে সামাজিক উদ্যোগের (Social Mobilisation) সঙ্গে উপযুক্ত রাজনৈতিক ও আর্থিক পরিকাঠামো দরকার। আমাদের দেশেতো এই গুলির অভাব। তাহলে...

■■

ন তু ন | ব ই

■■

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

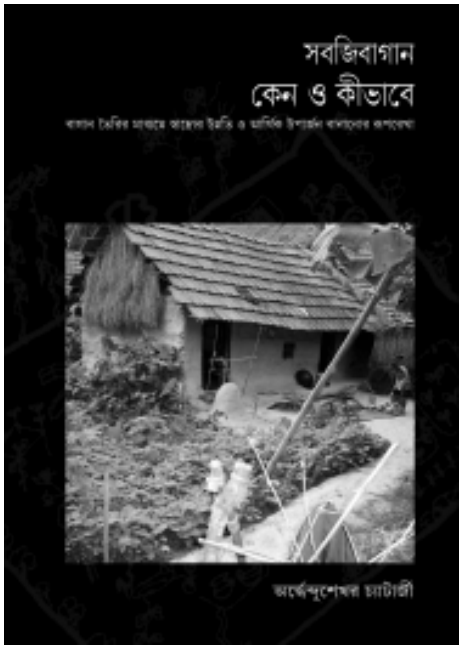

■■

১/১৬ ডিমাই সাইজে হোয়াইটপ্রিন্ট কাগজে ছাপা। পাতা সংখ্যা, ৪৫ পাতা, দাম ১৫ টাকা।

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু